প্রথম অধ্যায়

স্তোত্র সাহিত্যের ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

স্তোত্র সাহিত্যের ভূমিকা

জড় ও জীব দিয়ে গঠিত — এই প্রত্যক্ষ গোচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। কিন্তু যেখানে তার স্থিতি অর্থাৎ মহাকাশ আর যা ঘটায় তার গতি অর্থাৎ মহাকাল — দুইটিই পঞ্চেন্দ্রিয়ের অগোচর। বুদ্ধির বিচার-বিশ্লেষণে ও বোধির স্বয়ংপ্রভ আলোকে তার স্বরূপের সন্ধান পায় মানুষ। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হল কেমন করে ও কেন? নিষ্প্রাণ জড়ের বুকে প্রাণ ও চেতনার আবির্ভাব হল কী ভাবে এবং কেন? — এই সদা-উদ্যত প্রশ্নাবলী নিয়ে সুদীর্ঘ কাল থেকে হয়ত মানব সৃষ্টির ঊষাকাল থেকেই মানুষ ভেবেছে — ভেবে চলেছে — কবি-দার্শনিক, ধ্যানী-জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক-ধর্মাচার্যগণ — সকলেই তার উত্তর খুঁজেছেন, খুঁজে চলেছেন। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই কোন সর্ব-সম্মত উত্তর মেলেনি।

তবে আদিম মানবগোষ্ঠীর জিজ্ঞাসুগণ এ সম্বন্ধে কী ভেবেছিলেন তার একটা নমুনা পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে। সর্বধ্বংসী মহাকালের বিরামবিহীন প্রচণ্ড আক্রমণের মধ্যে মানব মনীষার যে প্রাচীনতম সম্পদটি নিদর্শন রূপে রক্ষিত হয়েছে — সীমাহীন সমুদ্রের বুকে উন্নত শির পর্বত শৃঙ্গের মতো — তা বৈদিক সাহিত্য। দ্রষ্টা বৈদিক ঋষিগণ — নানা ক্ষেত্রে নানাভাবে এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজেছেন ও তা আশ্চর্য সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

বৈদিক ভাবনায় বিশ্ব সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনাসূত্রটি পাওয়া যায় ঋগ্বেদের নাসদাসীয় সূক্তে (১০।১২৯)। পুরুষ সূক্তে (১০।৯০), হিরণ্যগর্ভ সূক্তে (১০।১২১), সৃষ্টি সূক্তে (১০।১৯০), তৈত্তিরীয় উপনিষদে (অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ (২।৭।১), ছান্দোগ্যে (সদেব সোম্য ইদমগ্রে আসীৎ - ২।৬।১), বৃহদারণ্যকে (আত্মৈবেদমগ্রে আসীৎ (১।৪।১) ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ (১।৪।১০) ইত্যাদি মন্ত্রের মধ্যে। মূল কথা — আদিতে 'এক' ছিলেন — অসৎ, সৎ, ব্রহ্ম, আত্মা — নানা নাম ও পরিচয় তাঁর। সেই 'এক' - এর ইচ্ছা হল বহু হবেন।

একা তো আনন্দ হয় না, তিনি দ্বিতীয় কামনা করলেন। দুই হলেন। (স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রেমে। স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ – বৃহ ১।৪।৩) জায়া ও পতি। কামনা করলেন সৃষ্টির জন্য বহু হবেন তিনি। (স অকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি। তৈত্তিরীয় ২।৬।৩)। তিনি আনন্দ স্বরূপ। কাজেই আনন্দ থেকেই উদ্ভব হয়েছে বিশ্বের, আনন্দেই বিশ্ব স্থিত এবং পরে আনন্দের মধ্যেই তার পর্যাবসান। (আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি-জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসং বিশন্তি ইতি – তৈত্তিরীয় ৩।৬।১)। ঋষিবর্গের অনুভবে, – জীবজগৎ সবকিছু ব্রহ্মের বিস্তার – ব্রহ্মই আনন্দস্বরূপ। আনন্দরস আস্বাদন – আত্মরস আস্বাদন-ই বিশ্বজগতের একমাত্র হেতু। ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও এই ভাবনার প্রতিধ্বনি শোনা যায় –

আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে
দিন রজনী কত অমৃত রস
উথলি যায় অনন্ত গগনে।

উপনিষদের এই আনন্দই বৈষ্ণব ভাবনায় কৃষ্ণরতিকে আশ্রয় করে বিচিত্র লীলারসে উচ্ছলিত।

(খ)

জড় ও জীবের মধ্যে মুখ্য পার্থক্য এই যে সাধারণ দৃষ্টিতে জড় নিষ্প্রাণ আর জীব প্রাণবান। 'সাধারণ দৃষ্টিতে' কথাটির তাৎপর্য এই যে – জড় নিষ্প্রাণ বস্তু নয়। আসলে তা অনভিব্যক্ত বা অব্যক্ত-প্রাণ সত্তা। জড়েরই বিবর্তনে বা বিকাশে প্রাণের উদ্ভব। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতেও যার মধ্যে প্রাণ-বীজ নেই, তার বিবর্তন-বিকাশে প্রাণের উদ্ভব সম্ভব নয়। বৈদিক ঋষিও বলেছেন – 'প্রাণস্যেদং বশে সর্বং

যাহোক, প্রাণের জগত তথা প্রাণী জগত সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির নিয়মের অধীন। মনোবান প্রাণী মানুষের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়েছে প্রাণ-বিশ্বের যুগ পরিবর্তন। তার পূর্ব পর্যন্ত স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় প্রাণী একই প্রাকৃতিক নিয়মের কঠোর বিধি অনুসরণ করে আবর্তিত হয়েছে গাছ, মাছ, গরু, ছাগল, কীটপতঙ্গ – হাজার হাজার বছর ধরে একই ভাবে – একই জৈবধর্মের অনুসরণ করে। কোন ক্ষেত্রেই মনুষ্যেতর প্রাণীর জীবনযাপনে নিজের কর্তৃত্ব ছিলনা, থাকে না, এখনও নাই। কিন্তু মন ও বুদ্ধির বিকাশের ফলে মানুষের মধ্যে উদ্ভব হয় চিন্তাশক্তির, আসে জিজ্ঞাসা আর সেই সূত্রে সৃষ্ট হয় দর্শন-বিজ্ঞান, শিল্পসাহিত্য, রাষ্ট্র, সমাজ। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ মনের মুখ্যতঃ তিনটি বৃত্তির কথা বলেন – ইচ্ছা, চিন্তা ও অনুভূতি। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে মনের বৃত্তি সংকল্প বিকল্পাত্মক আর বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি। প্রাণস্তরে পশু পাখী – সবই একান্তভাবে ইন্দ্রিয়ের – বিশেষ বিশেষ ভোগ্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষার উপর সম্পূর্ণ অধীন, বুদ্ধিজাত বিচার বিতর্ক সংযম, রুচির নির্ণয়াদি নিছক প্রাণ বা প্রাণীস্তরে অনুপস্থিত। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে মন-বুদ্ধির এই দিকটির গুরুত্ব প্রধান। কঠোপনিষদে একটি সুন্দর রূপকে ও কাব্যময় ভাষায় মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির যে পরিচয় আছে – সেটি উল্লেখ করা যাক –

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তা ইত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥
(কঠোপনিষৎ ১।৩।৩-৪)

মূল কথা দেহরথের রথী আত্মা। বুদ্ধি সারথি মন হচ্ছে লাগাম – আর ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ভোগেচ্ছু ঘোড়ার মতো। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের রাশ ধরে মন আর মনরূপ সেই লাগামটি ধরে থাকে সারথি বুদ্ধি। রথকে তথা রথীকে নির্দিষ্ট ও উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে চালনা করে। মনোবান বুদ্ধিমান মানুষ – নিজের ইচ্ছা মতো, বিচার বিশ্লেষণ মতো যাবতীয় কর্ম করতে চায়, গড়তে চায়, হতে চায়। মানুষ প্রাণ-ভূমে প্রকৃতির

বিদ্রোহী সন্তান – অন্যান্য প্রাণীর মতো ব্যাকরণের পরিভাষায় মানুষ – কর্ম বা object নয়। কর্তা বা subject হতে চায়। এই চাওয়ার ফলেই মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

(গ)

আদিম মানুষের মনে এই জিজ্ঞাসা বা জানবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল কীভাবে এবং তার অন্তরে কী কী ভাবের উদয় হয়েছিল, সে দিকে নেত্রপাত করা যাক। মাতৃগর্ভের ঘনান্ধকার থেকে ভূমিষ্ঠ সদ্যোজাত মানবশিশু আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে – প্রাণ-ক্রিয়ার প্রথম বিস্ফোরণে জোরে কেঁদে ওঠে – ভয়ে ও বিস্ময়ে। যেন জানতে চায় এইসব কী – কিমিদম্? ভয় মিশ্রিত বিস্ময়ের ব্যাকুল জিজ্ঞাসার বস্তু তথা জগৎ জিজ্ঞাসা। তারপর মাতৃক্রোড়ে স্তন্যপানরত শিশু মায়ের মুখের দিকে আনন্দে তাকায় – জগৎ নয়, মানুষ দেখে যেন জানতে চায় – কে তুমি – কস্ত্বম্? প্রেম মিশ্রিত বিস্ময়। এখনকার নবজাতকের তথা সর্বকালের সকল নবজাতকের দৃষ্টি বা মানসিকতার আলোকে আদিম মানুষের জিজ্ঞাসার সূত্রটি যদি সন্ধান করা যায় তবে বিশ্বজগৎ ও বিশ্বমানবের সম্বন্ধে আদিম মানবের জিজ্ঞাসার একটা পথরেখা পাওয়া বোধহয় অসম্ভব নয়। আর এই জিজ্ঞাসার মনশ্চিন্তনে ও মনোভাবনায় কঠোর সাধনায় – বৈদিক পরিভাষায় কঠোর তপস্যার ফলে অধিগত হয়েছে – জড় ও প্রাকৃত বিজ্ঞানে বহু বিচিত্র সমৃদ্ধি, – রচিত হয়েছে মানুষের পরিবার - সমাজ, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি। এই বিসৃষ্টি ও আবিষ্কার নিঃসন্দেহে অতুলনীয় সম্পদ হলেও সবটা নয়, আরো একটি জিজ্ঞাসা মানব জীবনচর্যায় অপেক্ষিত ছিল সেটি আত্মদৃষ্টি বা অধ্যাত্ম দৃষ্টি। এটা জিজ্ঞাসার তৃতীয় তথা অন্তস্তর।

মানুষ বহির্মুখী চোখে জগৎকে দেখেছে নিবিড়ভাবে এবং আরও গভীরভাবে দেখবার জন্য ব্যাকুলতা সীমাহীন। এটিকে বলা যায় 'ইদম্', ভারতীয় ব্যাকরণের পরিভাষায় তৃতীয় পুরুষ। ভাষায় প্রথম এবং ইংরাজী ব্যাকরণের আমি-তুমি ছাড়া সবকিছু 'ইদম্'। তারপর দেখেছে মানুষকে – বিশ্বজগৎ ও নিজের মধ্যখানে স্থিত তোমাকে ব্যাকরণের মধ্যম-

পুরুষ বা Second Person 'তুম্' - কে । জগত দেখা তথা বস্তুবিজ্ঞান লাভ হয়েছে, মানুষ দেখা তথা সমাজ । মানব বিজ্ঞান বা সমাজ বিজ্ঞান লব্ধ হয়েছে – কিন্তু নিজেকে দেখা হয়নি । বিশ্বজিজ্ঞাসা এসেছে আত্মজিজ্ঞাসা আসেনি । কেন ? কঠোপনিষদে আছে —এই প্রশ্নের চমৎকার উত্তর । মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি সবই বহির্মুখ – তা দিয়ে জগৎ দেখা যায় – নিজেকে দেখা যায় না । কোন মানুষ উপনিষদের ভাষায় "আবৃত্ত চক্ষু" ধীর মানুষ চোখ ঘুরিয়ে যদি নিজের দিকে তাকাতে চায় এবং যদি পারেন – তবে নিজেকে চেনা যায় । এ যেন বিশ্বস্রষ্টার এক আশ্চর্য রসিকতা বা কৌতুক ।

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্ ।
কশ্চিদ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ.
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥ (কঠ - ২।১।১)

পর্যায়টি এইরূপ – বিশ্ব বীক্ষা, মানব দৃষ্টি – শেষে আত্মদর্শন । কিমিদম্ – কস্ত্বম্ - তারপর 'কোঽহং" এই আধ্যাত্ম দৃষ্টি থেকে সৃষ্টি ধর্ম ও আধ্যাত্মভাবনা । ব্যাকরণের পরিভাষায় – উত্তম পুরুষ । পাশ্চাত্য ব্যাকরণের প্রথম পুরুষ । যাই হোক এই ত্রিমুখী জিজ্ঞাসা – বহির্জগৎ, মানবজীবন ও আত্মস্বরূপ এবং তা থেকে সমাহৃত জ্ঞান ও উপলব্ধি নিয়ে মানুষের মনুষ্যজীবনের – ব্যষ্টিগত ও সমষ্টি-গত উভয় দিক থেকেই সার্থকতা ।

(ঘ)

বিশ্বের যাবতীয় জীবের মধ্যে মনোবলে বুদ্ধিমান মানুষই শ্রেষ্ঠ । এই শ্রেষ্ঠত্ব কতগুলি জ্ঞান ও উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত । পাঁচটি ইন্দ্রি-পথে – চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, রসনা মাধ্যমে, মানুষের বহির্জগতের জ্ঞান ও অনুভব হয় – দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, স্পর্শন ও আস্বাদন ক্রিয়া ঘটে । ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই যে বস্তুজগত, ব্যক্ত জগত, জৈব জগত – তা মানুষের ক্ষেত্রে বহিরঙ্গ জ্ঞান মাত্র । এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়

সংযুক্ত জ্ঞানের গভীরে মনোজগতে – জাগ্রত অবস্থায় ভাবনা কল্পনার মধ্যে এবং নিদ্রাকালে স্বপ্নরূপে রচিত হয় এক পরোক্ষ অবচেতন- মহাজগত । মন-বুদ্ধি-বোধির স্পন্দনে এখান থেকে, এই অন্তরঙ্গ সমুদ্রের তরঙ্গের দোলায়, জেগে ওঠে, ভেসে ওঠে মানুষের বিচিত্র জিজ্ঞাসাগুলি – আর তা প্রাপ্তির জন্য বহুমুখী সংগ্রাম ও সাধনার সংকল্প রচিত হয় মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি ।

দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি-বোধি সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ জীব এই সমষ্টি মানুষও আবার শক্তির তারতম্যে ও রুচির বিভিন্নতায় ব্যষ্টি কেন্দ্রে স্বতন্ত্র – ভিন্ন ভিন্ন সীমাবদ্ধতায় খণ্ডিত । কারো দৈহিক শক্তি সমধিক, প্রাণশক্তিতে কেউ বা প্রবলতর, আবার মন-বুদ্ধি শক্তির ঔজ্জ্বল্যে কেউ বা গরিষ্ঠ । ব্যষ্টির ও সমষ্টির মধ্যে যে শ্রেণী বিভাজন হয়, তার মূলে মুখ্যতঃ থাকে শক্তির প্রকার বৈচিত্র্য ও পরিমাণ প্রাচুর্য । এক এক গুণধর্মের প্রভূত সমাবেশের ফলে যে অতিশয়তার প্রকাশ হয়, তা থেকে কেউ হন বীর যোদ্ধা, কেউ হন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক, কেউবা স্থিতিপ্রজ্ঞ ঋষি । কিন্তু পরিচিত মানুষের বা মনুষ্যদেহধারীর মধ্যে – তা যে কোন পর্যায়েই হোক না কেন – সাধারণভাবে অতিশয় ভাবনার একটা সীমাবদ্ধতা থাকে । কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে তখন শক্তির বিরাট বিস্ফারণ ঘটে, তখন বুদ্ধির অগম্য, দুর্জ্ঞেয়, ভয়ংকর বিস্ময়কর অতিশয্যকে একটি অতি মানুষিক ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করি, সভয়ে নতমস্তক হই । পণ্ডিতগণ মনে করেন এটাই দেব-কল্পনার প্রসূতি সদন ।

'দেব' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয় । নিরুক্তকার যাকে বলেছেন – "দেবো দানাদ্ বা দীপনাদ বা দ্যোতনাদ্ বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা ।" অর্থাৎ যিনি দান করেন বা দীপিত করেন, বা দ্যোতিত হন বা দ্যুলোকে বাস করেন – তিনি দেবতা । এই গুণগুলি আলাদা আলাদা করে ধরা যায় । আবার সাকল্যেও ধরা চলে । দেবতার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করে মানুষ এবং তা পায় । দেবতার রূপ তখন দাতা । দেবতার রূপ সর্বদাই উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত । ঋগ্বেদের দেববর্গের শক্তি ও দীপ্তি বিচার করলে মনে হয় যে ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, বায়ু, অগ্নি প্রমুখ দেবগণ যেন প্রকৃতির এক একটি শক্তির ঘনীভূত বিগ্রহ । অবস্থান ভেদে দেবগণকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে । অগ্নি, অপ্, পৃথিবী, সোম আদি ভূলোকের

দেবতা, সূর্য, মিত্র, বরুণ, দ্যু, পূষা, সবিতা, আদিত্য ঊষা প্রভৃতি দ্যুলোকের দেবতা। আর পৃথিবী ও দ্যুলোকের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ লোকের দেবতা – ইন্দ্র, বায়ু, রুদ্র, মরুৎ, বিষ্ণু, পর্যন্য প্রভৃতি। এদের মধ্যে আবার তিন লোকের তিনজন মুখ্য দেবতা। যাস্কের ভাষায় – "তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ অগ্নিঃ পৃথিবী স্থানো বায়ুর্বেন্দ্রো বান্তরিক্ষ স্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ।" অর্থাৎ পৃথিবীর প্রধান দেবতা অগ্নি অন্তরীক্ষের ইন্দ্র বা বায়ু আর আকাশের সূর্য।

বৈদিক দেবতাদের সংখ্যা কত ? ঋগ্বেদে ৩৩টি দেবতার কথা আছে। "যে স্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ"। (৮।২৮।১) অবশ্য এদের বাইরেও অনেক দেবতার কথা আছে ঋগ্বেদে। এমন কি দেবতাদের ঊর্ধ্ব সংখ্যা ঋগ্বেদেই উক্ত হয়েছে ৩৩৩৯ জন। "ত্রীণি শতা ত্রিসহস্রণ্যগ্নির ত্রিংশচ্চদেবা নব চাসপর্যণ্। (১।৯।১)। যদি এইভাবে বলা যায় যে মানুষের প্রার্থনা পূরণ করতে পারেন যে দিব্যশক্তি তিনি-ই দেবতা – তবে প্রয়োজন ভেদে মানুষের চাওয়ার যেমন শেষ নেই – তেমনি সংখ্যারও অন্ত থাকে না। দেবতা অসংখ্য।

পৌরাণিক যুগে দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে উত্তরকালে লৌকিক দেবতার সংযোজনে আরও সংখ্যাধিক্য ঘটেছে। তার থেকেও বিস্ময়কর ঘটনা – যুগভেদে দেবতাদের মহিমা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে উন্নয়ন ও অবনয়ন। ঋগ্বেদের শ্রেষ্ঠ দেবতা ইন্দ্র। পৌরাণিক যুগে স্বর্গের রাজা হয়েও উপেন্দ্র তথা বিষ্ণুর তুলনায় নিম্নস্থ। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ছাড়া পৌরাণিক যুগে নারীদেবতার বিশেষতঃ শ্রীদুর্গা ও কালিকার গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরবর্তীকালে চণ্ডী, মনসা প্রমুখ দেবী-ও শক্তি-দেবী মণ্ডলে বৃত হন। ধর্মঠাকুর ও অন্যান্য লৌকিক দেবতা-ও আছেন। অভারতীয় বীর্যের মধ্যে ইহুদী, খৃষ্ট ও ইসলাম ধর্মেও জিব্রায়েল প্রমুখ দৈবীশক্তি-সম্পন্ন ঈশ্বরের দূতগণকে দেবশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না কি ?

(৩)

জীব মাত্রেই বেঁচে থাকতে চায় । জিজীবিষা প্রাণের সাধারণ ধর্ম । মানুষও জীব, কাজেই জিজীবিষু । কিন্তু আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন- এই মৌল প্রাণ বা পাশব বৃত্তিচতুষ্টয়ের মাধ্যমেই মানবজীবনের পূর্ণ সার্থকতা লাভ হয় — কোন স্থান ও কালের মানুষই মনে করে না ! তবে মানুষের 'বাঁচা' বা সার্থক জীবন যাপন সম্বন্ধে অবশ্যই মতভেদ আছে । প্রথম তর্ক জীবন বলতে কি বুঝায় — তা নিয়ে । একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্তই কি জীবনের শেষ, না, দেহান্তে আরও কিছু অবশিষ্ট থাকে — আত্মারূপে - পরকালে ? ঐহিক ও পারত্রিকবাদীদের জীবন-ধারণার এই বৈপরীত্য ও বিতর্কটি অতি প্রাচীন । দেহাত্মবাদী চার্বাকপন্থীরা বলে — মরে গেলেই সব শেষ — আর কিছুই থাকে না মানুষের । যাকে চিতায় পুড়িয়ে ফেলা গেল, সে আবার আসবে কীভাবে ।' ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ' কিন্তু অধ্যাত্মবাদীরা বলেন যে দেহ পুড়ে যায় কিন্তু দেহী আত্মারূপে অবিনশ্বর । আত্মা — স্থূলদেহের মধ্যে অবস্থিত থাকে ও কর্মফল ভোগ করে জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে । হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মীরা জন্মান্তরে বিশ্বাসী । খৃষ্ট ও ইসলাম ধর্মে জন্মান্তরের কথা নেই, আছে শেষ বিচারের দিনের কথা । যা হোক্ ধর্মবিশ্বাসী মাত্রেই আস্তিক । সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে ইহ ও পরলোক — অর্থাৎ জীবন ঐহিক ও পারত্রিক দুই দিকেই প্রসারিত । তাদের কাছে পাপ পুণ্য, শুভ-অশুভ কর্মের রং আলাদা । জীবনের সার্থকতার মানও ভিন্নতর । সুখকে কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন ভোগ কর্মের মধ্যে — সম্পূর্ণ দেখে না কোন ধর্ম । কাজেই জীবনযাপনের লক্ষ্যগত ও পন্থাগত পার্থক্য থাকার জন্য, ধর্মে বিশ্বাসী আস্তিক মানুষের জিজীবিষার বা বাঁচবার এষণার রূপও আলাদা । তাঁরা কেবল ইহলোকের নয়, পরলোকের পক্ষেও যা কল্যাণকর ও সুখদ সেই কর্মে প্রবৃত্ত হন ।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কে আশ্রয় করে যে বিশ্ববৈচিত্র্যের বিস্ময়কর প্রকাশ — তার মূলে আছে একটি শক্তি , যা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের জন্য দায়ী — তিনি ভগবান বা ঈশ্বর । জগতের যা কিছু আছে, ঘটছে ঘটবে সবই এক ঈশ্বরের ক্রীড়া বা

লীলা। দেবদেবীর মধ্যে সে এদের-ই বিচিত্র বহু শক্তির প্রকাশ। দেবতারা দিতে পারেন, কাজেই তাঁদের কাছে প্রার্থনা করা যায়।

এই সচেতন দেবশক্তি ঈশ্বর শক্তি জ্ঞানে তার পূজা অর্চনা করা যায়। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তার কাছে প্রার্থনা, আবেদন নিবেদন করা যায়। স্তব ও স্তোত্র জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় বিপন্ন বা সম্পন্ন মানুষের হৃদয়ের আর্তি ও আকুতি পরিস্ফুট। আর এইজন্য তাকে সাহিত্য বলতে বাধা নেই। তাই স্তোত্র সাহিত্য অভিধাটি যে সার্থক, সুপ্রযুক্ত ও অর্থবহ তাতে সন্দেহ নেই।

(চ)

মনুষ্য সভ্যতার প্রারম্ভিক কাল থেকেই নৈসর্গিক শক্তির প্রকাশ ও বৈচিত্র্য কে বিস্ময়ে ভয়ে দর্শন করেছে মানুষ। দেবতা রূপে –প্রণাম করেছে, তার কাছে আবেদন নিবেদন করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এসেছে শ্রদ্ধা ও প্রীতি – তা থেকে নৈকট্য ও অনুরাগ বেড়েছে। এই অনুরাগে – ঈশ্বরের প্রতি উত্তম ও শ্রেষ্ঠ অনুরাগের নাম-ই ভক্তি। "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" কাজেই দেবতারূপী ঈশ্বরের প্রতি যে অনুরাগ তাই ভক্তিরূপে প্রকাশ পেয়েছে পূজার্চনায়, বন্দনায়-প্রণামে স্তবে স্তোত্রে বিচিত্র ও বিপুলভাবে। বৈদিক সাহিত্যের সংহিতা অংশ – সূক্তসমূহ – মূলতঃ স্তোত্র। অর্থাৎ বিভিন্ন দেবতার কাছে মানুষের আর্ত আবেদন ও প্রার্থনা।

পরবর্তীকালে পুরাণ ও তন্ত্রসাহিত্যের মধ্যেও এই স্তব-স্তুতির ধারা অব্যাহত গতিতে ভক্তির গাঢ় রসে রঞ্জিত হয়ে আরও নিগূঢ় ভাবে প্রবাহিত। ভক্তি-বাদী আচার্যগণের রচনার কথা বাদ দিয়েও অদ্বৈতবাদী শ্রীশংকরাচার্যের রচনার মধ্যে সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্যের যে বিস্তার ঘটেছে তা বিস্ময়কর। রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্যে এবং বিভিন্ন পুরাণে স্তোত্র সাহিত্যের যে সরল, বলিষ্ঠ, হৃদয়গ্রাহী বিস্তার-ভক্তিরসের মাধুর্যে, কাব্যসৌন্দর্যের বৈচিত্র্যে তার আস্বাদন অভিনব ও মহিমময়।

(ছ)

স্থান ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যষ্টি মানুষের ও সমষ্টি মানুষের তথা সামাজিক মানুষের যে পরিবর্তন ঘটে – সেটা মুখ্যতঃ ভোগ্য উপকরণ বাহুল্য বৈচিত্র্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ বহিরঙ্গ রূপান্তর। মানুষের অন্তরঙ্গ এষণা জিজীবিষা - সুন্দর জীবন যাপনের মৌল আকুতি তা অপরিবর্তনীয়। কাজেই কালপ্রবাহের মধ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যেও মূল এষণা কাজ করে চলে – স্থান কালের পরিবর্তন, ভাব-ভাষার রূপান্তর বাহ্যিক ব্যাপার মাত্র। কাজেই – ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার বাহিরে যে অচেনা-অজানা শক্তি – দৈবশক্তি ঐশীশক্তি যে নামই দেই না কেন ভয়ে বা প্রীতি বশে তার প্রতি একটা সহজ নির্ভরতা বোধ জাগে। আসে আকুতি, প্রার্থনা – আর তা ভাষায় স্তোত্র হয়ে ফুটে ওঠে। ভক্তিবাদে ভয়ের স্থান আছে ঐশ্বর্যের দিকে। আবার সৌন্দর্যের দিকে থাকে প্রীতি। কাজেই যুগের ভাষা-ভঙ্গী, রীতি-নীতিকে আশ্রয় করে, চির-তন বা শাশ্বত মানব মন, আস্তিক্য বুদ্ধিদ্বারা উদ্দীপিত মন ভক্তি ভাবে ও রসে আপ্লুত হয়ে যায় অতি সহজেই এবং তার ফলে উৎসের সঙ্গে – উত্তর-প্রবাহের একাত্মতা রচিত হয়। এই অনুষঙ্গে সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্যের ধারার সঙ্গে বাংলা ভক্তি-সাহিত্যের ভক্তি-গীতি ও কাব্যের সংযোগ সূত্রটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বলে মনে করার যুক্তি-সঙ্গত কারণ আছে। আমরা আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে যুক্তি প্রমাণ যোগে এটাই উপস্থাপিত করার প্রয়াস নিয়েছি।

(জ)

আমাদের প্রস্তাবিত গবেষণা নিবন্ধের শীর্ষক –'সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্য ও বাংলা ভক্তি-গীতি কাব্যসাহিত্যের সম্পর্ক সূত্র – একটি সমীক্ষা।' আলোচনাক্রম এই প্রকার —

প্রথম অধ্যায় – স্তোত্র সাহিত্যের ভূমিকা।

দ্বিতীয় অধ্যায় – স্তোত্র সাহিত্যের পরিচয় বৈচিত্র্য, শ্রেণী বিন্যাসাদি।

তৃতীয় অধ্যায় — সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্য ও বাংলাসাহিত্যের আদি-মধ্য যুগ ।

চতুর্থ অধ্যায় — সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্য ও ঊনবিংশ শতকের ভক্তি-গীতি কাব্য ।

পঞ্চম অধ্যায় — উপসংহার ।

পরিশিষ্ট — ক) স্তোত্র সাহিত্য ও ভক্তি-গীতি কাব্যের কিছু নির্বাচিত সংকলন ।

খ) গ্রন্থপঞ্জী ।

বস্তুত: দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই স্তোত্র সাহিত্যের সংজ্ঞা, শ্রেণীবিভাগ, পরিচয়াদি দিয়ে মূল আলোচনার প্রত্যক্ষ সূত্রপাত করা হয়েছে । এই অংশে সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্যের পরিচয় প্রসঙ্গে বেদপুরাণাদি ও আচার্যগণের স্তোত্রাদির আলোচনা ও উদাহরণাদি দেওয়া হবে । তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে মুখ্যত: বাংলা সাহিত্যের ধারায় স্তোত্র সাহিত্যের যে বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে তার সোদাহরণ বিচার বিশ্লেষণ আছে ।